শুধু তাই নয়, স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেও মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার হারও মেয়েদের মধ্যেই বেশী। শুধু বেশী বললে কম বলা হবে। মাঝপথে পড়াশুনা পরিত্যাগ করার ঘটনা মেয়েদের ক্ষেত্রে যে হারে বা সংখ্যায় ঘটে, তা হতাশাজনক।

'শিক্ষা ও নারী' সম্পর্কিত বিষয়টিকে আর এক দিক থেকে আলোচনা করা আবশ্যক। ভারতে শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ উভয় ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিকতা ও পুরুষ-প্রাধান্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সকল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাতেই পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই আধিক্য অনস্বীকার্য। প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের পাঠক্রমে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধিক্য নারী অবদমনের পথকেই প্রশস্ত করে। ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থার প্রকৃতি, পোষাক-আশাক সম্পর্কিত নিয়ম-নির্দেশ, কর্মশিক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম প্রভৃতি পর্যালোচনা করা দরকার। তাহলে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হবে যে, এদেশের ছাত্রীদের রক্ষণশীলতার ছাঁচে ফেলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণে চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের অসাম্য-বৈষম্যের শিকার হতে হয়। প্রচ্ছন্নভাবে হলেও চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। স্বভাবতই চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই অসাম্য-বৈষম্যের কারণে চাকরিতে মহিলাদের সংখ্যা তুলনামূলক বিচারে অনেক কম।

তবে বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমী প্রভাব ভালভাবেই পড়েছে। স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের আধিক্য এখন অনেকাংশে অপসারিত। ছাত্রীদের সংরক্ষণবাদী হিসাবে শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ-আয়োজনও কমেছে। বর্তমানে স্কুল-কলেজে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে। বিয়ে করার পরেও মেয়েরা এখন পড়ছে। চাকরির ক্ষেত্রে সৃষ্ট নতুন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে মহিলাদের অধিকতর উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে।

রাজনীতি ও ভারতীয় নারী

ভারতে সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতিক ব্যবস্থা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাম্প্রতিককালে জনজীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই ভারতের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি অর্থবহ হয়ে উঠে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রেও কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার রীতিনীতির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে এ দেশের রাজনীতিক দলগুলি মুক্ত নয়। স্বভাবতই ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের অবদমিত অবস্থান এবং পুরুষের আধিপত্য অনস্বীকার্য। পঞ্চায়েত ও পৌর পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সংরক্ষণমূলক আইন আছে এবং তা অনুসরণ করা হয়। এই কারণে পঞ্চায়েত ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার সন্তোষজনক। কিন্তু রাজ্য স্তরে ও জাতীয় পর্যায়ে পরিস্থিতি হতাশার সৃষ্টি করে। বাস্তব অবস্থা হল রাজনীতির নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার কমতে থাকে। উচ্চতর পর্যায়ে রাজনীতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুপস্থিতির বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর অদ্যাবধি লোকসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার কখনই আট শতাংশের অধিক হয়নি। ১৯৮৯ সালে লোকসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা তুলনামূলক বিচারে সব থেকে কম ছিল। রাজ্য বিধানসভায় এবং সংসদের লোকসভায় তেত্রিশ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিষয় নিয়ে রাজনীতিক দলগুলির সদিচ্ছার অভাব লোকসভায় আলোচনায় নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মূলকথা হল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার রীতিনীতির নিগড় থেকে ভারতীয় রাজনীতির বন্দিদশা এখনও ঘোচেনি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S. C. Dube)-র একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেছেন : "In 1989, the ruling party (Congress-I) had promised women 30 percent of the electoral seats contested by the party, but this was not done. The record of the opposition was no better."

সনাতন ভারতে মহিলাদের জীবনধারা ছিল অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত—সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। জায়া-জননীর ভূমিকার মধ্যেই নারীজাতির জীবন পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। বিংশশতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এই অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা এই সময় সনাতন বিধি-নিষেধের অচলায়তন ছেড়ে এগিয়ে আসতে শুরু করে। পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে মহিলারাও এই সময় রাজনীতিক, প্রশাসনিক ও পেশাগত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অভিজাত ভারতীয় পরিবারের মহিলারা অন্তপুরের পর্দা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা রাখেন। বিভিন্ন নির্বাচনে ক্রমশ অধিকসংখ্যায় তাঁরা ভোট দেন। মহিলারা সরকারী চাকরিতে যোগ দিতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় মহিলারা নির্বাচিত হন। কালক্রমে মহিলারা বিচারপতি,

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্যের রাজ্যপাল, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ও অ-রাজনীতিক পদে আসীন হন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকাগত পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং মহিলাদের মর্যাদার উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্য রহিত। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ভারতে মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কিত ভারত সরকারের একটি কমিটির প্রতিবেদনের বক্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অবস্থান ও ভূমিকা অভিপ্রেত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে নি। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এই অধিকারের স্বীকৃতি দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক প্রক্রিয়ার অংশীদার বা উপাদান হিসাবে মহিলাদের ভূমিকাকে উপযুক্ত মর্যাদাযুক্ত করতে পারে নি। রাজনীতিক ক্ষমতা ও সাম্যের ক্ষেত্রে এই আইনগত স্বীকৃতি এক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এক ধারণার সৃষ্টি করেছে। পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা ঠিক। কিন্তু রাজনীতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার মত কার্যকর ক্ষমতা মহিলাদের হাতে আসে নি।

মহিলাদের অবস্থান উপেক্ষিত

আর যদিও বা কিছু রাজনীতিক ক্ষমতা মহিলাদের হাতে এসে থাকে, তা বাস্তবে নগণ্য। সংখ্যাগত বিচারে মহিলারা সংখ্যালঘু নয়। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষমতা, শ্রেণী ও মর্যাদার বিচারে মহিলাদের অবস্থান উপেক্ষিত। রাজনীতিক দলগুলির কাছে মহিলারা সাধারণভাবে পুরুষের অনুগামী পরছায়া হিসাবে পরিগণিত হয়। মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিষয়টি অসংগঠিত ও অসংহত। অসাম্য-বৈষম্যের ব্যাপারে তাদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে নানারকম অসঙ্গতি বা পরস্পর বিরোধিতা বর্তমান। তারফলে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের মর্যাদা ও ভূমিকা বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়েছে। উল্লিখিত কমিটি তার প্রতিবেদনে আরও বলেছেন যে, রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনে তারা অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে। তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করতে এখন অনেক বেশী আগ্রহী। কিন্তু দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক প্রক্রিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকা এখনও অনেকাংশে গুরুত্বহীন। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে মহিলাদের মধ্যে রাজনীতিক শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারে এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সক্রিয় করার ব্যাপারে রাজনীতিক দলগুলি উদ্যোগহীন। তাছাড়া অধিকাংশ রাজনীতিক দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সনাতন সমাজের চলে আসা বিবিধ সংস্কার ও মনোভাবের প্রভাব থেকে রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গও মুক্ত নন। আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর দু'দশকের অধিককাল ইতিমধ্যে অতিবাহিত। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির মূল বক্তব্য বর্তমানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে এমন কথা বলা যায় না।

ভারতের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার গুরুত্বহীনতা মার্কসবাদীরা ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিককালের পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রকৃতি মহিলাদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা করে। প্রচলিত মতাদর্শ মহিলাদের উপর প্রতিবন্ধকতামূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারফলে বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে বা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে

মার্কসীয় ব্যাখ্যা

মহিলারা উদ্যোগী হন না বা হতে পারেন না। সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুগত থাকার ও অনুগত জীবনযাপনের ব্যাপারে আবহমান কাল থেকে মহিলাদের সামাজিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বা বাধ্য করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে মহিলাদের সাম্য, সমানাধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত। তা ছাড়া এ দেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের স্বার্থেও সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু চলে আসা সমাজব্যবস্থার সাবেকি ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান ও তার গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা সামঞ্জস্যহীন ও সংঘাতপূর্ণ। এ রকম এক সামঞ্জস্যহীন রাজনীতিক সামাজিকীকরণ মহিলাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। এই কারণে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যাপারে মহিলাদের দিক থেকে অসুবিধা দেখা দেয়।

গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থায় দু'দিক থেকে রাজনীতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা যায় ঃ এক, নাগরিকদের রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও গুরুত্ব আরোপ এবং দুই, ক্ষমতা

নির্বাচন ও রাজনীতিক অংশগ্রহণ

অধিগ্রহণ ও প্রয়োগ। এই দুটি পর্যায়ে জনগণের রাজনীতিক অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যাবে। এবং এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী পর্যালোচনার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত আলোচিত সাধারণ নির্বাচনগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সম্যকভাবে সংকলন বা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় নি। নির্বাচন কমিশন আগে নির্বাচন সম্পর্কিত যে সমস্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে মহিলা প্রার্থীদের

আলাদা করে চিহ্নিত করা হয় নি। কমিশনের প্রতিবেদনে মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা এবং তাদের ভোটের হারও হিসাব-নিকাশ করে দেখান হয় নি। তবে কমিশনের পরবর্তী কালের প্রতিবেদনসমূহে মহিলা প্রার্থীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দেখান হয়েছে। তবে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে কমিশন তার প্রতিবেদনে মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা ও শতকরা হিসাব এবং তাদের প্রদত্ত ভোট ও তার শতকরা হিসাব পৃথকভাবে পর্যালোচনা করেছে। পুরুষ ভোটদাতাদের সংখ্যা ও তাদের প্রদত্ত ভোটের শতকরা হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজনীতিতে ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদির উৎস হিসাবে একটি প্রতিবেদন ও একটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এন.পি.সেঠ (N.P.Seth) কর্তৃক প্রস্তুত প্রতিবেদনটির নাম হল *Political Participation of Women* এবং এস.ডি.মুনি (S.D.Muni) কর্তৃক প্রণীত রচনাটির নাম হল *Women in the Electoral Process*।

প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, পুরুষ ভোটদাতাদের তুলনায় মহিলা ভোটদাতাদের ভোট প্রদানের হার কম। পুরুষের তুলনায় মহিলারা কম হারে ভোট দেন—এই তথ্য বা সিদ্ধান্ত বিভিন্ন গবেষণা সূত্রে ব্যাপকভাবে সমর্থিত। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী পর্যালোচনায় এবং গবেষণামূলক অনুসন্ধানে সিদ্ধান্তটি স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছে। ডঃ মহাপাত্র *Tribal Politics in West Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ 'Politics is a man's business'— this is how women, in almost all the countries of the world, have conceptualised of things political.'' মিলব্রাথ ও গোয়েল (L.W.Milbrath and M.L.Goel) তাঁদের *Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ ''The finding that men are more likely to participate in politics than women is one of the most throughly substantiated in social science.''

মহিলা ভোটদাতা

নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। নির্বাচনী অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানকারী উপাদানসমূহের ব্যাপারে মহিলাদের অবস্থান প্রতিকূল। সাধারণভাবে ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম নিয়ে ভারতীয় মহিলাদের অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হয়। ঘরকন্যার বিবিধ কাজে তাঁদের মোট সময়ের অধিকাংশটাই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই কেটে যায়। প্রকৃতিগত ভাবে ভারতীয় মহিলারা রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাদী। এঁদের উপর গণ-মাধ্যমসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তুলনামূলক বিচারে অনেক কম। স্বভাবতই সমকালীন পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার মান নীচু হয় এবং জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। তা ছাড়া আমাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষ-প্রধান সমাজে মহিলারা স্বভাব বশেই পুরুষসঙ্গীর অনুগামী হয়। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মানসিক গঠন এবং আচার-আচরণের প্রকৃতি এ রকমই হয়ে থাকে। ঘরের বাইরের যাবতীয় বিষয়ে মহিলারা পুরুষ-নির্ভর। আবার মুষ্টিমেয় যে সমস্ত মহিলা গণ-মাধ্যমসমূহের সংস্পর্শে আসেন, তাঁরাও রাজনীতিক বিষয়াদিতে আগ্রহ দেখান না। চাকুরীজীবী বা কর্মরত মহিলারা রাজনীতিক সংবাদাদির পরিবর্তে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের প্রতি আকৃষ্ট হন। নিজের চাকরির দায়িত্ব পালনের পর পরিবার-পরিজনের পরিচর্যায় তাঁদের সময়ের অনেকটাই চলে যায়। অতঃপর রাজনীতিক বিষয়াদিতে তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না। আবার যাঁরা চাকরি করেন না, বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নিতান্তই কম। সমকালীন রাজনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান বা ধারণা তাঁদের থাকে না। পরিবার-পরিজনের ভাল মন্দের বাইরে তাঁরা রাজনীতিক ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চান না। ভোট দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁদের তেমন আগ্রহ থাকে না। এই সমস্ত কিছুর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাজনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের সচেতনতা, সক্ষমতা ও বিচক্ষণতা কম হয়। এবং স্বাভাবিক ভাবেই মহিলাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের হারও কম হয়। ডঃ মহাপাত্র *Tribal Politics in West Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ''.....the concept of feminine role especially in a traditional social setup is one which considered a most effective deterent to participation.'' মহিলাদের ভোট প্রদানের হার কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভার্মা ও নারাইন (S.P.Varma and I. Narain) তাঁদের *Voting Behaviour in a Changing Society* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ ''The relatively weak electoral participation of woman may be attributed to more than one reason — the traditional hearth and home concept of her place in society, her social dependence, near absence of direct political involvement, lack of special efforts at women's political mobilisation and so on.''

নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার ব্যাখ্যা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশে সম্পাদিত গবেষণামূলক অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায় যে, রাজনীতিক অংশগ্রহণমূলক কাজকর্মে পুরুষের থেকে মহিলারা অনেক পিছিয়ে। দেশের সাধারণ রাজনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের সক্রিয়তার হার অনেক কম। সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নতর স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে

এ কথা অধিকতর সত্য ও প্রাসঙ্গিক। সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নতর স্তরে অবস্থিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এ সত্য হলেও, উচ্চতর স্তরে অবস্থিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও এলিট শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না। এই শ্রেণীর মহিলাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের হার পুরুষদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের হারের থেকে সামান্যই পৃথক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে রাজনীতিক অংশগ্রহণের হারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমছে। মহিলাদের ভোট প্রদানের হার বাড়ছে। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন, ঘরের বাইরের চাকরি-বাকরি, পেশাগত অন্যান্য ভূমিকা প্রভৃতি ঐতিহ্যবাদী ভারতীয় মহিলাদের মনোভাব-মানসিকতায় পরিবর্তন সূচিত করেছে। শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ, আধুনিক গণ-মাধ্যমসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ঘরের বাইরের চাকরি প্রভৃতি মহিলাদের মানসিক গঠনে পরিবর্তন এনেছে এবং রাজনীতিক অংশগ্রহণের হারকে ইতিবাচক দিকে প্রভাবিত করেছে। ডঃ সংঘমিত্রা সেন চৌধুরী (Sanghamitra Sen Chaudhuri) তাঁর *Women and Politics : West Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ''.... scholars generally agree that sex differences in political participation are diminishing. Milbrath and Goel hold that 'economic and social modernization is slowly eroding this sex differences.'' পশ্চিমবঙ্গের একটি পরিসংখ্যান দিয়ে অধ্যাপিকা সেন চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, নারী ও পুরুষ ভোটদাতাদের প্রদত্ত ভোটের শতকরা হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। উল্লেখ করার মত বিষয় হল যে ১৯৮৭ সালে মহিলাদের প্রদত্ত ভোটের হার পুরুষদের প্রদত্ত ভোটের হারের থেকে অধিক ছিল। অধ্যাপিকা সেন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলের মহিলা ভোটদাতাদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মহিলা ভোটদাতাদের ভোট প্রদানের হার অধিক। তিনি বলেছেন ঃ The survey data indicate that in West Bengal the rural women's turnout was higher than the urban women's turnout.''

ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য কমছে

এ প্রসঙ্গে মহিলা রাজনীতিবিদ বা প্রার্থীদের নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনা ও হারের বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা বরাবরই কম। অর্থাৎ মহিলাদের মোট সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধিত্বের হার কম। এই পরিস্থিতি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেকের অভিমত অনুযায়ী মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার কম হওয়ার কারণ মহিলাদের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত আছে। রাজনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের আগ্রহের অভাব অবিদিত নয়। আবার সাধারণভাবে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেই অনেকে অধিকতর সক্রিয়তা ও কিছুটা জঙ্গী ভাবের অস্তিত্ব পছন্দ করেন। কিন্তু এ বিষয়েও মহিলারা পিছিয়ে। সর্বোপরি এ বিষয়ে ভোটদাতাদের একটি অংশের মধ্যে এবং কিছু রাজনীতিক নেতার মধ্যে অল্পবিস্তর কুসংস্কারের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। কোন কোন গবেষক-চিন্তাবিদ্ এমন কথাও বলেছেন যে, অনেক রাজনীতিকের মধ্যে ও নির্বাচনী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে মহিলা প্রার্থীদের ব্যাপারে কুসংস্কারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। অধ্যাপিকা সেন চৌধুরীর মতানুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা হতাশাজনক। তিনি বলেছেন ঃ ''It has so far been less than 10 per cent of the total seats contested and not more than 1 per cent of the total number of male candidates contesting for the same number of seats.'' তবে সামগ্রিক বিচারে ভারতের বিভিন্ন নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে বর্তমানে রাজনীতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে ইতিবাচক আইন প্রণীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনে মহিলা প্রার্থীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যাই হোক আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা কম হওয়ার কারণে মন্ত্রিসভায় এবং উচ্চতর রাজনীতিক পদসমূহে মহিলাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

মহিলা প্রার্থীদের সম্ভাবনা

মহিলাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর বিবিধ আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাব- প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা-দীক্ষা, বয়স, বৃত্তি প্রভৃতি মহিলাদের রাজনীতিক আচার-আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক বিবিধ উপাদান গঠিত ও প্রভাবিত হয়। এবং এই সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক প্রভাবের ফলে ব্যক্তি-মানুষের আচার-ব্যবহার, বিশেষত রাজনীতিক অংশগ্রহণের ধারা প্রভাবিত হয়। কারণ বিভিন্ন প্রকারের রাজনীতিক অংশগ্রহণের সহায়ক উপাদানসমূহ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল সূত্রেই পাওয়া যায়। মহিলাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণ প্রসঙ্গেও এ কথা সমভাবে সত্য। রাজনীতিক অংশগ্রহণের অভিব্যক্তি বিভিন্নভাবে ঘটে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে রাজনীতিক অংশগ্রহণ ঘটে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে মিটিং মিছিলে

অংশগ্রহণ; জনসভায় যোগদান; রাজনীতিক পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ রকম রাজনীতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার নিতান্তই কম। আবার রাজনীতির এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষদের অংশগ্রহণের হারও খুব বেশী নয়।

সাধারণভাবে এ কথা স্বীকৃত যে, নির্বাচনে ভোট না-দেওয়ার হার মহিলাদের মধ্যেই অধিক। বিভিন্ন গবেষণামূলক অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায় যে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে এবং শহরাঞ্চলের অধিবাসী মহিলাদের মধ্যে নির্বাচনে ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকার প্রবণতা কম। তা ছাড়া যে সমস্ত মহিলা অ-কৃষিমূলক বৃত্তিতে নিযুক্ত এবং আর্থিক অবস্থা ভাল, তাদের মধ্যেও নির্বাচনে ভোট না-দেওয়ার সংখ্যা কম। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি নির্বাচনে ভোট প্রদানের সঙ্গে সদর্থকভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মহিলারা সাধারণত ভোটপ্রদান থেকে বিরত থাকেন না। কিন্তু অধ্যাপিকা সেন চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গে সম্পাদিত তাঁর গবেষণামূলক অনুসন্ধান সূত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের থেকে শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে ভোট না-দেওয়ার প্রবণতা অধিক। অর্থাৎ নির্বাচনে ভোট না-দেওয়ার সংখ্যা গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের থেকে শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যেই অধিক। এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপিকা সেন চৌধুরি বিবিধ কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতানুসারে শহরাঞ্চলে বসবাসের কারণে রাজনীতিকদের সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। ভোট দেওয়াটাকে তাঁরা দায়িত্ব বা কর্তব্য বলে মনে করেন না। নগরবাসী মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের রাজনীতিক নিন্দাবাদ দেখা দেয়। অপরদিকে গ্রামবাসী মহিলারা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব সচেতন। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের কর্তব্যবোধ কাজ করে। তাঁদের মধ্যে রাজনীতিক নিন্দাবাদ অনুপস্থিত।

ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা

অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে ভারতীয় মহিলাদের রাজনীতিক সচেতনতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী ভারতে রাজনীতিক সচেতনতা সম্পন্ন মহিলার সংখ্যা অত্যন্ত কম। মহিলারা সাধারণত কোন রাজনীতিক দলের সক্রিয় সদস্য হন না। খুব কম সংখ্যক মহিলাই নির্দিষ্ট কোন রাজনীতিক দলকে সমর্থন করেন। নির্বাচনের উদারনীতিক মতবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক ভোটদাতা সাধারণত তাঁর পছন্দ অনুসারে প্রার্থী বা দলকে ভোট দেন। কিন্তু মহিলাদের নির্বাচনী আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একথা খাটে না। সাধারণত স্বামীর রাজনীতিক বিশ্বাস ও মনোভাব অনুযায়ী স্ত্রী তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ মহিলাদের নির্বাচনী আচরণ রাজনীতিক সামাজিকীকরণ বা রাজনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অধ্যাপক আহুজার সমীক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকার যুক্ত মহিলাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। অধ্যাপক আহুজার মতানুসারে এই পরিসংখ্যান মহিলাদের রাজনীতিক সচেতনতার পরিচয়বাহী নয়। ভোট দিতে যাওয়ার নামে মহিলারা বাইরে বেরোবার এক সুযোগ পায় এবং সাধারণত তার সদ্ব্যবহার করে।

পুরুষশাসিত হিন্দু সমাজ ও মহিলাদের কাছে দাবি

পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষশাসিত হিন্দু সমাজের চেহারা-চরিত্র সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। সনাতন হিন্দু সমাজের বহু ও বিভিন্ন বিষয় এখনও অব্যাহত আছে। এরকম একটি বিষয় হল সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির কাছে কতকগুলি বিশেষ গুণ আশা করা হয়। এই গুণগুলি ব্যতিরেকে সমাজে মহিলাদের ভাল চোখে দেখা হয় না। অর্থাৎ মহিলাদের মধ্যে এই সমস্ত গুণ একান্তভাবে কাম্য বলে বিবেচনা করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে অভিপ্রেত এই গুণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

কুমারীত্ব বা সতীত্ব মেয়েদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। হিন্দু সমাজে প্রাক্ বিবাহ যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বলা হয় যে, বিবাহের আগে কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়ের যৌন সংযোগ-সম্পর্ক থাকা চলবে না। অনুরূপভাবে আবার বিবাহের পরেও শুধুমাত্র স্বামীর সঙ্গেই যৌন সম্পর্ক থাকবে; অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হিন্দু সমাজে আশা করা হয় যে, বিবাহের পর পত্নী পতিকে সর্বান্তকরণে অনুসরণ করে চলবে। বিবাহিতা স্ত্রী তার সত্ত্বাকে স্বামীর সত্ত্বার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করবে। পত্নী নিজেকে পতির ছায়া হিসাবে প্রতিপন্ন করবে। আপদে-বিপদে পত্নী পতির পাশে থাকবে এবং পতিকে শক্তি-সাহস যোগাবে। পতি-পত্নীর সম্পর্ক হল জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। অর্থাৎ পত্নীকেই নিজেকে পতির উপযোগী করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগী হতে হবে। এ বিষয়ে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর, স্বামীর কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

শুধু তাই নয়, বিবাহের পর পত্নী নিজেকে পতির পরিবারের উপযোগী করে তুলবে। পতির পরিবারের ছাচে পত্নী নিজেকে নতুন করে তৈরী করবে। পতির পরিবারের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পত্নী পুরোপুরি আয়ত্ত করে নেবে। এ ক্ষেত্রেও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পত্নীর ; পতির পরিবারের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এই কারণে পত্নীকে এককভাবে উদ্যোগী বা সচেষ্ট হতে হয়।